দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2.9 MAR 1986..
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ১ ...

075

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৯২

এসএসসি পরীক্ষা ঃ বায়াত্তর ও ছিয়াশি

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম স্কুল সার্টিফিকেট ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম বিজয় দিবসের পর মাস চারেকের মধ্যে। দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাভাবিক অবস্থা তখনো ফিরে আসেনি। সবদিকে অগোছাল অবস্থার মধ্যে একসাথে সারাদেশের কয়েক হাজার কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা মোটেই সহজ ছিল না। তবু পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যেও বিশৃঙ্খল অবস্থায় বায়াত্তরে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেয়া হয়। এমন অস্বাভাবিক পরিবেশে পরীক্ষা স্বাভাবিক ধারায় চলতে পারেনি। নকলবাজি ব্যাপকভাবে চলেছে। স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ওপরে ওঠেনি এবং বই-খাতার ধারে-কাছে পর্যন্ত বিশেষ ভেড়েনি এরকম হাজার হাজার প্রার্থী অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই সাথে কয়েক লাখ নিয়মিত পরীক্ষার্থী তো ছিলই। এত বিপুলসংখ্যক সার্টিফিকেট প্রার্থীকে শৃংখলার মধ্যে রাখা ও তাদের নকলবাজি ঠেকানো তখনকার অবস্থায় কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং নকলের পাল্লায় সেবার বহু গরু-ঘোড়াও পরীক্ষায় উতরে গিয়ে পাস সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। সেই গণটোকাটুকির বদনাম গত চৌদ্দ বছর ধরে সমানে গাওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে দেশ স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে আসার সাথে সাথে শিক্ষা ও পরীক্ষায় কিছুটা শৃংখলার ভাব এলেও গোড়ার দুর্নাম কাটেনি। "বায়াত্তরের পাস" মানে নাসকা ওয়াস্তে পরীক্ষা দিয়ে পাসের সার্টিফিকেট পাওয়া। এইভাবে কথাটা আজো অনেকে ব্যবহার করে থাকেন, যদিও গত সাত/আট বছর ধরে পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলবাজি আবার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বোর্ডের স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাই শুধু নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিগ্রী পরীক্ষায় নকলের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। আইন শাস্ত্রের পরীক্ষায় বে-আইনী কাণ্ডকারখানার কমতি নেই। ইদানীং প্রতিবছর ফাজেল, দাখেল প্রভৃতি পরীক্ষায় অনেক কেন্দ্রে রীতিমতো অশান্তির ঘটনা ঘটছে। কেবল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নয়, পরীক্ষকদের এবং পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরেও দুর্নীতির পোকা সাংঘাতিকভাবে বাসা বেঁধেছে। নকলের পাল্লা তো চলছেই, প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগে ফাঁস হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নকল ধরার অপরাধে পরীক্ষা তত্ত্বাবধানকারীদের পিটুনি খাওয়া, পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা এখন স্বাভাবিক ব্যাপারই। পরীক্ষাশেষে পাসের সার্টিফিকেট নেয়া ও নম্বর বাড়ানোর জন্য তদবিরকেও প্রায় দেশাচার বলা যায়।

এবছরের স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলছে। ব্যাপক নকলবাজি, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং আরো যেসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড এবার ঘটছে তা দেখে ছিয়াশির এস এস সি পরীক্ষাকে বায়াত্তরের পরীক্ষার সাথে কেউ কেউ তুলনা করেছেন। পত্রপত্রিকায়ও এ সম্পর্কে খবর এবং চিঠিপত্র ইতিমধ্যে বেশ ছাপা হয়েছে। গত ২৪শে ও ২৫শে মার্চ তারিখের দৈনিক 'সংবাদ'-এ দু'জন পাঠকের চিঠি ছাপা হয়েছে। এবারের পরীক্ষায় ব্যাপক অনাচার দেখে এর প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন। বায়াত্তরের সাথে এ বছরের পরীক্ষার তুলনাও করা হয়েছে একটি চিঠিতে। নকলবাজির দিক থেকে বিচার করলে এ তুলনাকে যুক্তিযুক্ত বলা যায়। তফাৎ কেবল এইটুকু যে তখন দেশব্যাপী বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছিল, আর গত দশ বছরে শান্তি-শৃংখলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে এবং দেশবাসী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় সুখ ও স্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে পারছে বলে সরকারী মহল জোর গলায় বলছেন। এসব কথার প্রতিবাদ করার সাহস কম লোকেরই আছে। আমরাও সে সাহস দেখাতে যাবো না। তবে পত্রলেখকদের সুরে সুর মিলিয়ে পরীক্ষা যে ধারায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার এবং শিক্ষা ব্যবস্থারও বদল করার জন্য সরকারকে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবো।

শিক্ষার বর্তমান ধারা-ব্যবস্থা বহাল রেখে পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অনাচার বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ এবং উন্নত দেশগুলির শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই আমাদের শিক্ষার ধারার অসারতা একবাক্যে স্বীকার করেন। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থায় আমলা ও কেরানী তৈরী হতে পারে, স্বাধীন দেশের অগ্রগতি সাধনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী নাগরিক সৃষ্টির উপাদান এর মধ্যে নেই। সুধীজন এসব নিয়ে আলোচনা অনেক করেছেন, লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু ধারা পাল্টায়নি। শিক্ষা সংস্কারের জন্য কমিশন, কমিটি নিয়োগ করে বাইরের আদল সামান্য ফেরানোর চেষ্টা করা হলেও ভিতরের অন্ধকার ঠিকই রয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষার সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। সরকার মেহেরবানি করে এ ট্রাডিশান বদলে উদ্যোগী হোন সবিনয়ে এ অনুরোধও রাখতে হয়।

দেশের প্রায় কোন স্কুল-কলেজে লেখা-পড়ার কাজ খুব সামান্যই হয়ে থাকে। লেখাপড়ার পরিবেশ নেই, শিক্ষকদের পড়ানোর গরজ নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের অভাব বাড়ছে। এমনিতে বছরের তিনশ' পয়ষট্টি দিনের মধ্যে দু'শ' দিনের বেশী স্কুল-কলেজে ছুটি থাকে। এর ওপর একটু কিছু ঘটলেই সরকারী নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তবু ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দিয়ে পাসের সার্টিফিকেট নিতে হয় কর্মসংস্থানের তাগিদে। শিক্ষার প্রতি পদে এত বাধার মধ্যেও সার্টিফিকেট ছাড়া যেখানে গতি নেই, সেখানে সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলবাজি ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় কি? এ পরিস্থিতির নিশ্চয়ই আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। সরকার এ বিষয়ে আবারো ভেবে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।